একটি রাজনৈতিক বিশ্লেষণ এবং কিছু পরামর্শ

কাজী জহিরুল ইসলাম

আমাদের মাথার ওপর একজন ভাই আর একজন দাদা আছেন। বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে যা-ই ঘটুক না কেন, ধরেই নেওয়া হয় তাতে এই দু'জনের কারো না কারো সম্পৃক্ততা রয়েছে। গত বছরের শেষের দিকে রাজনৈতিক অঙ্গন খুব তাতিয়ে ওঠে। রোজই নতুন নতুন খবর আসে। আমরা একবার মনে করি এটা দাদার কাজ, আবার পরদিনই মনে হয় না, না, এটা ভাইয়ের কাজ। অবশেষে নাকি ভাই-ই জিতে গিয়েছিলেন। ইয়াজউদ্দীনের তত্বাবধায়ক সরকার তারই ফসল। কিন্তু সেই ফসল ঘরে তুলতে পারেন নি ভাইয়ের অতি আদরের বোনটি। অন্ধকার টানেলের শেষ প্রান্তে দেখা দেওয়া আলোর রেখা আমরা বুঝি ছুঁয়েই ফেলেছি। ওয়ান-এলেভেনের সরকার দূর্নীতি ও অনিয়মের অন্ধকার থেকে জাতিকে মুক্ত করবে, এই বিশ্বাসে আমরা বুক বাঁধলাম।

ফখরুদ্দীন আহমদের নেতৃত্বে গঠিত ক্রান্তিকালীন সরকারের পায়ের নিচে গণতন্ত্রের মাটি নেই। কারণ তারা নির্বাচন করে ক্ষমতায় আসেন নি। দেশপ্রেমের সর্বশেষ আশ্রয়স্থল হলো আমাদের সেনাবাহিনী। সেনাবাহিনীর সহায়তায় এই সরকার ক্ষমতায় আসেন জাতিকে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকারসমূহের সীমাহীন দূর্নীতি ও অনিয়ম থেকে উদ্ধার করতে। মিডিয়ার কল্যাণে আমরা জেনেছি দেশে এই সরকারের পক্ষে গণজোয়ার সৃষ্টি হয়েছে। দেশের মানুষ এই সীমাহীন দূর্নীতি থেকে মুক্তি চায়। সরকারও জোরেসোরে প্রচার করেন, এই সরকারের মূল লক্ষ্য দেশ থেকে দূর্নীতি নির্মূল করা। দূর্নীতির বিরুদ্ধে রক্তপাতহীন এমন একটি যুদ্ধ আমাদের সকলেরই কাম্য ছিল। দেশী-বিদেশী প্রশংসাপত্রে দেশ ভেসে যেতে লাগলো। তাহলে এই সরকারের পায়ের নিচে এখন মাটি আছে। এক পায়ের নিচে দূর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার শপথ, অন্য পায়ের নিচে সেনাবাহিনীর আশির্বাদ। দূর্নীতি নির্মূলে এই সরকার যে বদ্ধপরিকর আমরা তার প্রমাণও পেতে শুরু করলাম। দূর্নীতিপরায়ন বাঘা বাঘা সব রাজনীতিবিদ, মন্ত্রী, আমলা ধরাশায়ী হতে লাগলো। সবাই বলতে লাগলো, বাপরে, তেজ আছে.....সাবাশ ফখরুদ্দীন সাবাশ। কেউ কেউ বলতে শুরু করলো, শেষ পর্যন্ত পারবেতো? বাঘের পিঠে চড়েছে। দূর্নীতি করে থাকলে খালেদা-হাসিনাও (শীর্ষ রাজনৈতিক নেতা) রেহাই পাবে না, এমন কথাও উপদেষ্টারা বলতে শুরু করলেন। গর্বে আমাদের বুক দশ ইঞ্চি উঁচু হয়ে উঠলো।

বাঘের পিঠে চড়ার জন্য তাকদ লাগে। আমরা ধরেই নিয়েছি আমাদের এই সরকারের সেই তাকদ আছে। কারণ তারা একদল সৎ মানুষ। অতীতে নিজ নিজ পেশাগত জীবনে এই সততার পরিচয় তারা দিয়েছেন। ক্ষমতায় এসেই সরকার বিচার বিভাগ পৃথকীকরণের উদ্যোগ নেন, বহুল আলোচিত দূর্নীতি দমন কমিশন, নির্বাচন কমিশন, অতঃপর পাবলিক সার্ভিস কমিশনকে ঢেকে সাজান। প্রসাশনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যাপক রদবদলের মধ্য দিয়ে সৎ ও যোগ্য মানুষকে সঠিক চেয়ারে বসানোর চেষ্টা করেন। আমরা দেখতে পাই সুশাসন প্রতীষ্ঠা ও দূর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রে এ সরকার বদ্ধপরিকর। মাঝে মাঝে সরকার প্রধান, প্রধান উপদেষ্টা, জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দিয়ে সরকারের অবস্থান জনগণকে জানান। এই পর্যন্ত ভালোই ছিল। কিন্তু হঠাৎ করেই মনে হলো সরকার বুঝি কিছুটা দিশেহারা হয়ে পড়েছেন। বাঘটা কি বেশী লাফ-ঝাপ দিচ্ছে? আর তাতে কি বাঘের আরোহী ভীত?

মানুষ যখন একটি অচেনা গুহায় ঢুকে পড়ে তখন সবসময়ই বের হওয়ার রাস্তাটা খোলা রাখার চেষ্টা করে। আমাদের মনে হতে লাগলো ওয়ান-এলেভেনের সরকার বাঘের পিঠে চড়ে যে গুহায় ঢুকেছেন সেই গুহা থেকে বের হওয়ার পথ খুঁজছেন। এ সময়ে প্রফেসর ইউনূসের রাজনৈতিক দল গঠনের ঘোষণা তাদেরকে স্বস্তি এনে দেয়। কিছুদিন না যেতেই ইউনূস বুঝে ফেলেন ক্ষমতায় না যেতে পারলে একটি দল নিয়ে রাজনীতির মাঠে ঝুলে থাকার কোন মানে হয় না। তিনি দলের বিলোপসাধনও করে ফেলেন। দল গঠনের ঘোষণা এবং তার বিলোপসাধন দুটোই অপরিণত সিদ্ধান্ত মনে হয়েছে। তিনি খুব বিচক্ষণ মানুষ। নোবেল জয় করে আমাদের আনন্দে কাঁপিয়েছেন, উল্লাসে ভাসিয়েছেন। আমরা তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ।

এখন তত্বাবধায়ক সরকার গুহা থেকে বের হওয়ার জন্য সম্ভবত প্রশস্ত কোন দরোজা দেখছেন না। তারা এই ভয়ে ভীত হয়ে পড়লেন, যদি আওয়ামী লীগ বা বিএনপি আবার ক্ষমতায় আসে তাহলে তাদেরও নানান কায়দায় বৈধ-অবৈধভাবে ঝুলিয়ে দেবেন। সুতরাং যে কোন ভাবেই হোক এই দুই দলকে ক্ষমতায় আসতে দেওয়া যাবে না। মাইনাস টু ফর্মুলা এর একটি কার্যকর উপায় বলে মিডিয়াতে ব্যাপক প্রচার পাচ্ছে। খালেদা-হাসিনাকে নির্বাসনে পাঠানোর প্রচেষ্ঠা গত বেশ কিছুদিন ধরে মিডিয়াগুলোকে গরম রেখেছিলো। খালেদা জিয়ার কনিষ্ঠ পুত্র আরাফাত রহমানকে দূর্নীতি সংশ্লিষ্ট অপরাধে গ্রেফতার করে আবার এই শর্তে নাকি ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল, খালেদা জিয়াকে দেশ ছাড়তে হবে। হাসিনা আমেরিকায় গেলেন, তার দেশে ফেরার পথে নানান রকম কাঁটা বিছানো হতে লাগলো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দুই নেত্রীকে নির্বাসনে পাঠানোর পরিকল্পণা সফল হলো না। আমরা এমনও শুনেছি খালেদা নির্বাসনে যেতে চাইলে তার দূর্নীতিপরায়ন জ্যেষ্ঠ পুত্র তারেক রহমানকেও ছেড়ে দেওয়া হবে। খালেদা জিয়া নিজেই নাকি দর কষাকষির এক পর্যায়ে এরকম প্রস্তাব দিয়েছিলেন। সবই আমাদের শোনা কথা। মিডিয়াতে প্রচারিত এই ঘটনাগুলো ক্রান্তিকালীন সরকারের ভিত কাঁপিয়ে দেয়। তাদের ডান পায়ের নিচ থেকে মাটি সরে যেতে থাকে। জনগণ সন্দেহ পোষণ করেন, হায়রে, এরাওকি তাহলে ধান্দাবাজ? সচেতন মানুষ এমন সন্দেহও পোষণ করেন আওয়ামী লীগ, বিএনপিকে ঠেকানো না গেলে শেষ পর্যন্ত নাকি ইনারা সেনাবাহিনীকে আমন্ত্রণ জানাতে পারেন।

আমি ব্যক্তিগতভাবে এই সরকারের সাফল্য কামনা করি। যদি নতুন দল গঠন করে এই সরকার তাদের নিষ্কন্টক নির্গমন পথ রচনা করতে চান, সেটারও সাফল্য কামনা করি। কারণ এই সরকারকে ব্যর্থ হলে চলবে না। একটি জাতির জীবনে দেশকে কলুষমুক্ত করার এমন সুযোগ বারবার আসে না। এই সুযোগটাকে শতভাগ কাজে লাগানো উচিত। বর্তমান সরকার দূর্নীতির বিরুদ্ধে যে যুদ্ধটা ঘোষণা করেছেন এই যুদ্ধে জয়ী হওয়া খুব জরুরী। সরকারের প্রতি পরামর্শ, দূর্নীতির বিরুদ্ধে যে লড়াইটা আপনারা করছেন, এটিই আপনাদের একমাত্র শক্তি। এর সাথে কোন রকম আপোষ করার চেষ্টা করবেন না। দুই নেত্রীকে বিদেশে পাঠিয়ে নিজেদের নিষ্কন্টক নির্গমনের কথা ভাবা বোকামী হবে। যে জনগণ আপনাদের মাথায় পুষ্পবর্ষণ করেছিল দূর্নীতিগ্রস্ত নেতা-নেত্রীকে বিদেশে পাঠালে সেই জনগণই আপনাদের দিকে ঘৃণার থু থু ছুঁড়ে মারবে। দূর্নীতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ, এই শক্তিই সমূহ সকল অশুভ বর্শার আঘাত থেকে আপনাদের বাঁচাতে ঢাল হিশেবে কাজ করবে।

গত বিএনপি সরকারের শেষের দিকে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যের উর্ধগতিতে মানুষ বেসামাল হয়ে পড়েছিল। এটা যে একদল অসৎ ব্যাবসায়ী-সিন্ডিকেটের কাজ, এটা প্রায় সবাই নিশ্চিত ছিল। সকলের প্রত্যাশা ছিল, এই সরকারের আমলে এইসব গজিয়ে ওঠা সিন্ডিকেট ভেঙে পড়বে এবং দ্রব্যমূল্য স্বাভাবিক হয়ে আসবে। কিন্তু তা হয়নি। বরং দ্রব্যমূল্য ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। নানান রকম ভয়-

ভীতির কারণে সৎ-অসৎ অনেক ব্যাবসায়ীই আমদানী বন্ধ করে রেখেছে। এতে করে সরকারের প্রথম তিন মাসেই নাকি ৫ হাজার কোটি টাকার আমদানী শুল্ক কমে গেছে। দূর্নীতির বিরুদ্ধে গৃহীত কর্মকান্ডে অটল থকার পাশাপাশি, সুশাসন প্রতিষ্ঠাসহ এই সরকারকে দক্ষতার সাথে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ করতে হবে এবং সামগ্রীক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির দিকটি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে দক্ষতার সাথে পরিচালনা করতে হবে। যদি তথাকথিত ব্যাবসায়ীয়া আমদানী বন্ধ করে দেয় তাহলে নতুন সৎ ও উদ্যমী ব্যাবসায়ী প্রজন্ম গড়ে তুলতে উৎসাহমূলক বাণিজ্য নীতি গ্রহন করতে হবে।

একটি কথা এই সরকারকে মনে রাখতে হবে, তাদের হাতে সময় খুব কম। এই কম সময়ে তারা সব কাজ শেষ করতে পারবেন না। কিন্তু শুরু করতে পারবেন। এই শুরুটা খুব দৃঢ় এবং স্পস্ট হওয়া বাঞ্ছনীয় এবং এই শুরুটাকে প্রাতিষ্ঠানিকতা দিতে হবে যাতে তারা চলে যাওয়ার পরেও এর ধারাবাহিকতা বজায় থাকে। ছবিসহ ভোটার তালিকা বা ভোটার পরিচয়পত্র তৈরী করা অত্যন্ত জরুরী একটি কাজ। এই বিষয়ে আমি আমার কসোভোর অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে ইতিপূর্বে এইটি গাইডলাইন দেবার চেষ্টা করেছি। এই কাজে এক বছরের বেশি সময় লাগার কথা নয়। যদি ১৮ মাসও লাগে তবুও এটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করেই নির্বাচনে যাওয়া উচিত। গড়িমসি না করে কাজে লেগে পড়তে হবে। কাজটি এমনভাবে করতে হবে যাতে গৃহীত তথ্য-উপাত্ত পরবর্তিতে জাতীয় পরিচয়পত্র এবং পাসপোর্ট তৈরীর মতো কাজে ব্যাবহার করা যায়। নতুন সহস্রাব্দের চ্যালেঞ্জগুলো মাথায় রেখে সাম্প্রতিকতম তথ্য-প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে প্রতিটি পদক্ষেপ নিতে হবে। যেনতেনভাবে দায়সারা গোছের কোন কাজ যেন না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা খুবই জরুরী।

বর্তমান সরকারের দীর্ঘসূত্রীতা গণতন্ত্রের সুস্বাস্থ্যের জন্য খুবই ক্ষতিকর। অন্যদিকে অল্পসময়ের মধ্যে সকল সংস্কারমূলক কাজও শেষ করা সম্ভব নয়। তারপরেও এই সরকারকে সম্ভাব্য স্বল্পতম সময়ের মধ্যেই কাজগুলো গুছিয়ে ফেলতে হবে। সকল ক্ষেত্রেই একটি ভাল ‘শুরু’ উপহার দিতে হবে এবং সেই শুরুটা যেন প্রাতিষ্ঠানিকতা পায় সেটা নিশ্চিত করতে হবে। এরপর অবাধ, সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে নির্বাচিত একটি গণতান্ত্রিক সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। এই সরকারের সাফল্য আমাদের জাতীয় জীবনের জন্য একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর উত্তরণ নিশ্চিত করবে। তাদের শুরু করা কাজগুলোর ধারাবাহিকতাই জাতি হিশেবে আমাদেরকে উন্নীত করবে প্রথম শ্রেণীতে।

আবিদজান, আইভরিকোস্ট
২৩ মে, ২০০৭

লেখক: কবি, জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক পেশাজীবী
ই-মেইল: qjohir@yahoo.com